ইউনিট- ৬

সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও বিশেষ শিশু

ইউনিট ৬ সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ শিশু

ভূমিকা

বিদ্যালয়ে যেসব শিশুরা লেখাপড়া করতে আসে তাদের অধিকাংশই সুস্থ স্বাভাবিক শিশু। এদের বাইরে যারা বিদ্যালয়ে আসতে পারে না তাদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা। যেমন অনেকে দারিদ্র ও সামাজিক চাপে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না, আবার কেউ কেউ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণে বিদ্যালয়ে আসতে পারে না। এই সব শিশুদেরই সাধারণভাবে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ শিশু বলা হয়।

সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ শিশুরা যেহেতু সাধারণ শিশুদের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির হয় তাই তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সচেতন শিক্ষকের প্রয়োজন। যদিও এইসব শিশুদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় রয়েছে তারপরও এদের মধ্যে থেকে কয়েকজন শিশু সাধারণ বিদ্যালয়েও চলে আসে। সুতরাং সেই দিকটির কথা বিবেচায় রেখেই এই ইউনিটে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ শিশুদের উপর মোট পাঁচটি পাঠ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৬.১: সুবিধা বঞ্চিত শিশু
পাঠ- ৬.২: সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিখন সমস্যা
পাঠ- ৬.৩: বিশেষ বা ব্যতিক্রমধর্মী শিশু
পাঠ- ৬.৪: ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর উপর পরিবার ও সমাজের প্রভাব
পাঠ- ৬.৫: বিশেষ শিক্ষা

পাঠ ৬.১ সুবিধাবঞ্চিত শিশু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের চিহ্নিত করতে পারবেন।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবেশগত বৈরিতা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

শিশুরাই একটি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারা নিজেদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার যত বেশি সুযোগ পাবে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎও হবে তত বেশি উজ্জ্বল। কেননা এই শিশুরাই একদিন দেশ ও জাতির নেতৃত্ব নিজেদের কাধে তুলে নিয়ে পৃথিবীর কাছে আমাদের মুখ উজ্জল করবে।

আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হচ্ছে শিশু অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সের নিচে। এই শিশুদের সবাই যেমন সচ্ছল পরিবার ভুক্ত নয় তেমনি শরীর ও মন মানসিকতার দিক দিয়েও সবাই সুস্থ না। এদের মধ্যে অনেক শিশু রয়েছে যারা অর্থনৈতিক কারণে অনেক সুবিধা ভোগ করতে পারে না আবার অনেকে আর্থিক সমর্থ থাকা সত্ত্বেও শারীরিক বা মানসিক কারণে সাধারণ শিশুদের মতে জীবন যাপন করতে পারে না। এই পাঠে এই সব সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের কথাই আলোচনা করা হবে।

চিত্র ৬.১.১: সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কয়েকজন।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা নানাদিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে

সমাজে এমন কিছু শিশু রয়েছে যারা স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে আগত শিশুদের চাইতে কিছুটা ভিন্ন। অর্থাৎ এই সব শিশুদের আর্থ সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের তাদের সাংস্কৃতিক পটভূমি দুর্বল এবং জীবনযাত্রার দিক দিয়েও তারা নিকৃষ্ট মানের জীবন যাপন করে। এই সব শিশুরা যে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা ও শিক্ষাগত কৃতিত্বের দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে তাই নয় বরং যে ব্যবস্থাগুলো মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায় সে সব সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত। এছাড়া জন্মগত ত্রুটি, নানাবিধ পঙ্গুত্ব ও বিকাশজনিত সমস্যার কারণে যেসব শিশুরা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে তারা স্বাভাবিক শিশুদের মত সহজ প্রাপ্য সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে না।

রাস্তার শিশু, শিশু শ্রমিক, পরিত্যক্ত শিশু বা এই ধরণের অসংখ্য শিশুরাই, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শিক্ষা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। আবার দেখা গেছে, যারা সব রকম শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত শিক্ষা ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে বা অনগ্রসর। শিশুদের এই অনগ্রসর হওয়ার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। তার মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা, পরিবেশগত বৈরিতা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং সর্বোপরি শিশুর ব্যক্তিগত বিভিন্ন বৈশিষ্টাবলী প্রধান। তবে মনে রাখতে হবে যে, কেবল বুদ্ধি কম হওয়া পিছিয়ে পড়ার একমাত্র নির্ণায়ক নয়। বৈরী পরিবেশ শিশুদের শিক্ষা অর্জনের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা উন্নত পরিবেশ গঠনের অন্তরায় হিসাবে কাজ করে। এখানে এই দুটি বিষয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হল।

পরিবেশগত বৈরিতা

যে কোন রকম বৈরী পরিবেশ শিশুদের উপর দারুন প্রভাব বিস্তার করে। শিশু জন্মগ্রহণ করেই ধীরে ধীরে তার পরিবেশকে চিনতে শিখে। তার পরিবেশ যদি অসুস্থ ও সমস্যাগ্রস্ত হয় তাহলে শিশু তাতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। অর্থাৎ শিশু অসুস্থ পরিবেশের উপযোগী করেই নিজেকে গড়ে তুলে। অসামাজিক পল-ী, বস্তি এলাকা, অজপাড়াগা, দরিদ্র জনবসতি ইত্যাদি সবই সমস্যাগ্রস্ত পরিবেশের অন্তর্গত। ফলে এইসব স্থানে বসবাসকারী শিশুদের উন্নত পরিবেশ সম্পর্কে কোন ধারণা থাকেনা। শিক্ষার অভাব ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন হয়ে তারা এরূপ সামাজের সাথে একাকার হয়ে যায়। পরিবেশগত বৈরিতা শিশুর মনকে ছোট করে দেয়, উন্নয়নের ইচ্ছায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সামাজিক ভাবে তাদের প্রতিবন্ধী করে দেয়।

অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা

অভাবের জন্যই অনেক শিশু শিক্ষার সুযোগ পায় না

অর্থনৈতিক দুরবস্থা অনেক শিশুর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ। ক্ষুধার জ্বালায় পড়ালেখা কি জিনিস, তা তারা জানে না- নতুবা জানলেও পড়ালেখা করতে মন চায় না। মা বাবা মনে করেন বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর চাইতে যোগালির কাজে দিলে অর্থনৈতিকভাবে উপকার হবে। অভাবের তাড়নায়, কতকটা সমাজের চাপে এসব শিশুদের লেখাপড়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষা মাত্রই ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া উন্নতমানের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যেরও যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। অতএব এগুলো সব কিছুর জন্যই কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক দুরবস্থা দায়ী। তাছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন অর্থ, যার অভাবে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতায় ভুগে। অপর দিকে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা মানুষের মধ্যে কর্মবিমুখতা সৃষ্টি করে। পরিণামে যা মানুষকে আরো দারিদ্রের দিকে ঠেলে দেয়। দারিদ্র, অর্থ, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা ইত্যাদি একটি চক্রের আকারে অবস্থান করে। এর কোন একটিতে প্রাধান্য দেখা দিলে চক্রাকারে তা অপর উপাদানগুলিকেও প্রভাবিত করতে

থাকে। প্রায় সব সুবিধা বঞ্চিত শিশুরাই এই উপাদানগুলোর মধ্য থেকে কোন এক বা একাধিক উপাদানের ঘাটতির শিকার হয়।

দেখা গেছে, এইসব সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শারীরিক ভাবেও খুব একটা ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী নয়। বেশির ভাগই অপুষ্টির শিকার, বয়সের তুলনায় উচ্চতায় এবং ওজনে তারা ঠিকভাবে বড় হয়ে উঠেনি। দরিদ্রতার কারণে সংসারে তেমন কোন যত্ন তাদের থাকে না। পুষ্টিকর খাদ্য ও শক্তির যে প্রয়োজন- তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। ফলে মানসিক বৃদ্ধিও তেমনভাবে গড়ে উঠে না। পুষ্টিহীনতার অভাবে শরীরে বিভিন্ন অসুখ লেগেই থাকে। যেমন- চোখে কম দেখা, কানে কম শুনা বা হাত পায়ের অক্ষমতা ইত্যাদি।

পরিশেষে বলব, এইসব সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা পরিবেশগত বা পারিবারিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে কোন কারনেই হোক না কেন তারা পিছিয়ে আছে এবং সহজেই তারা অনগ্রসর শিশু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পড়ছে। তাই আমাদের সকলের কাজ হবে, এই সুবিধাবঞ্চিত পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সারমর্মঃ

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার বেশ কিছু অংশ শিশু অর্থাৎ তাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে। এদের মধ্যে অনেক শিশুই রয়েছে যারা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বাধাগ্রস্ত। বিভিন্ন সমস্যায় এরা জর্জরিত। এসব শিশু বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। রাস্তার শিশু, শিশু শ্রমিক পরিত্যক্ত শিশু বা এ ধরনের অসংখ্য শিশু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পরিবেশগত বৈরিতা, সচেতনতার অভাব এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এদের প্রধান অন্তরায়। পরিবেশগত বৈরিতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা সামাজিকভাবে পঙ্গু, অভাবের তাড়নায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গির অভাব- এ সবকিছু মিলিয়েই তারা পিছিয়ে আছে। আমাদের কাজ হবে এদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, আমরা ভুলে যাব না এরাও সমাজের একজন।

পাঠ ৬.২ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিখন সমস্যা ও তার প্রতিকার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিখন সমস্যা আলোচনা করতে পারবেন;
- শিশুদের প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়ার কারণ বলতে পারবেন এবং
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিখনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করতে পারবেন।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সমস্যা

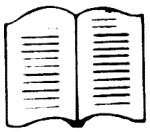

বাংলাদেশে "সবার জন্য শিক্ষা"- কার্যক্রমের যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও শহরের বস্তি ও রাস্তায় বসবাসরত ২০ লাখেরও বেশি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার তেমন কোন সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তার জন্য শুধু শিক্ষাখাতের অপ্রতুল খরচই দায়ী নয় বরং সুযোগ সুবিধা এবং প্রাসংঙ্গিক কর্মসূচীর অভাবও দায়ী। দেশে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা সত্ত্বেও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত শিশু শ্রমিকের উপর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৮ লাখ। যা দেশের মোট শ্রম শক্তির ১১.৩ ভাগ। এর ৪১ ভাগ নিযুক্ত ছিল কৃষিখাতে এবং বাকিরা অকৃষিখাতে। এই তথ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর্যোর এক জরিপে প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া শিশু অধিকার ফোরামের এক সমীক্ষায়ও দেখা গেছে, বাংলাদেশের শতকরা ১১ ভাগ শিশু শ্রম বিনিয়োগ করে জীবন যাপন করছে।

সুবিধাবঞ্চিত বহু শিশুই স্কুলে যেতে পারে না

বস্তি এলাকায় বালক বালিকার স্কুলে ভর্তির হার যথাক্রমে ৪৯% ও ৪৩% অথচ জাতীয় পর্যায়ে এই হার ৯০% এরও বেশী। চাহিদার তুলনায় বস্তি কিংবা শহর এলাকায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অপ্রতুল। ৬ হতে ১৪ বৎসর বয়সী ব্যাপক সংখ্যক শিশু ও কিশোর-কিশোরী স্কুলে না যেয়ে শিশু শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে; এদের মধ্যে মেয়ে শিশু শ্রমিকের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। শহরে ও গ্রামে দরিদ্র প্রকৃতির শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। দেখা গেছে যে, প্রাথমিক স্কুলের লেখাপড়া সম্পূর্ণ করা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বরাবরই কম। অথচ প্রথম শ্রেণিতেমেয়েদের ভর্তির শতকরা হার ছেলেদের তুলনায় অধিকই হয়। প্রথম অবস্থায় মেয়েদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বেশিই থাকে কিন্তু ক্রমে তা কমতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। ওপরের শ্রেণিগুলোতে ঝরে পড়ার হার অত্যাধিক। প্রধানত যেসব কারণে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে তার মধ্যে রয়েছে–

- অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।
- পারিবারিক প্রয়োজনে শিশুদের শ্রমদান।
- সামাজিক ভাবে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের অবমূল্যায়ন।
- দরিদ্র শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিম্নমান।
- পরিবারে শিখন সহযোগিতার অভাব।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের জটিলতা ও মেধা বিকাশে সুযোগের অভাব।
- স্বাস্থ্যহীনতা ও প্রয়োজীয় পুষ্টির অভাব।

চিত্র ৬.২.১: একটি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পড়াচ্ছেন।

এ ধরণের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক প্রচেষ্টা দরকার। তাদের আত্মিক, শারিরীক ও মানসিক ক্ষমতা বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন অপরিহার্য। সেই সাথে তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা দরকার।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই সব শিশুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য শিক্ষককে অনেক বেশি সক্রিয় ও সচেতন হতে হবে। প্রথম কাজ হবে, শিশুটির অনগ্রসরতার কারণ খুঁজে বের করা এবং তার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এসব শিশুরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত একই শিক্ষা পদ্ধতি ও উপকরণ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে না। তাই প্রয়োজন বোধে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহন করা দরকার।

সারমর্মঃ

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। শিক্ষালাভের মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে। দেশের উন্নতির জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষালাভের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্যি, শহরের বস্তি ও রাস্তায় বসবাসরত ২০ লক্ষেরও বেশি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় বস্তি কিংবা শহর এলাকায় সরকারী স্কুল কম। উপরন্তু ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়সী শিশু কিশোর-কিশোরী স্কুলে না গিয়ে শিশু শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। এদের জন্য প্রয়োজন নিরলস প্রচেষ্টা। ভিন্ন শিক্ষাক্রম, প্রয়োজন সচেতনাতা সৃষ্টি, সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থ বরাদ্দ। তাদের জানাতে হবে কেবলমাত্র পেশা লাভ নয় কিন্তু একজন সুস্থ স্বাভাবিক উন্নত রুচিবোধ সম্পন্ন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হলেও শিক্ষার প্রয়োজন।

পাঠ ৬.৩ বিশেষ বা ব্যতিক্রমধর্মী শিশু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- 'বিশেষ শিশু' বলতে কাদের বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- 'বিশেষ শিশুদের' কি কি নামে আখ্যায়িত করা হয় তা ব্যক্ত করতে পারবেন এবং
- 'বিশেষ শিশুদের' বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করতে পারবেন।

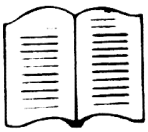

মানবিক দৃষ্টিতে সব শিশুকে আমরা 'বিশেষ শিশু' বলতে পারি। তবে এখানে আমরা 'বিশেষ শিশু' হিসাবে তাদেরকে বুঝবো যারা স্বাভাবিক শিশুদের কার্যকলাপ থেকে ভিন্ন। এই সকল 'বিশেষ শিশু' তারাই যারা শারীরিক, মানসিক অথবা সামাজিক সমস্যার জন্য নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এইসব শিশুদের প্রয়োজন, 'বিশেষ শিক্ষা', দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা, বিশেষ যত্ন এবং পরিচর্যা। ব্যতিক্রমধর্মী বা বিশেষ শিশুদের আওতায় পড়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মেধাবী শিশু।

ব্যতিক্রমধর্মী বা বিশেষ শিশুদের আখ্যায়িত করার জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ বা নাম প্রচলিত রয়েছে যেমন:

(ক) বিশেষ শিশু (Special Children)

(খ) ব্যতিক্রমধর্মী শিশু (Exceptional Children)

(গ) প্রতিবন্ধী শিশু (Disabled Children)

(ঘ) বাধাগ্রস্থ শিশু (Handicapped Children)

(ঙ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু (Children with Special Needs)

(চ) বিকলাঙ্গ অথবা পঙ্গু শিশু (Dysfunctioning Children)।

সাধারণভাবে ব্যতিক্রমধর্মী শিশু তাদের বলা হয় যারা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে উর্ধ্বে বা নিম্নে। যেমন, অতি মেধাবী অথবা প্রতিবন্ধী শিশু এবং তাদের উভয়ের জন্যই 'বিশেষ শিক্ষা' ব্যবস্থার প্রয়োজন।

ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের বৈশিষ্ট্য:

'ব্যতিক্রমধর্মী শিশু' বা 'বিশেষ শিশু' তাদেরকেই বলবো, যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে সে যদি স্বাভাবিক শিশুদের চেয়ে ভিন্ন হয়, তবেই তার বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন- তখনই সে 'ব্যতিক্রমধর্মী। এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

(১) বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য : বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী শিশুরা অত্যন্ত ভিন্ন। যারা অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন বা নিম্নবুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ অতি মেধাবী বা মানসিক প্রতিবন্ধী তারা সবাই ব্যতিক্রমধর্মী।

(২) ভাব আদান প্রদান বা ভাষাগত পার্থক্য : ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের কথা বলা ও ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সমস্যা থাকে।

(৩) ইন্দ্রিয় পার্থক্য : এই সব শিশুদের শ্রবণ এবং দৃষ্টিগত সমস্যা হয়।

(৪) আচরণগত পার্থক্য : এই সব শিশু আবেগের দিক থেকে বিপর্যস্ত এবং তারা সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অক্ষম।

(৫) বহু মাত্রিক এবং গুরুতর প্রতিবন্ধী : তাদের মধ্যে অনেক ধরণের বাধাপ্রাপ্ততার (Impairment) সমন্বয় ঘটে। যেমন- মস্তিষ্ক পক্ষাঘাত, মানসিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীন বা বধির।

৬) শারীরিক বৈশিষ্ট্য : অনেক শিশু শারীরিক ভাবেও প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ হাটতে পারে না, ধরতে পারে না বা শারীরিক ভাবে পক্ষাঘাত গ্রস্ত থাকে।

ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর শ্রেণিকরণ

অন্তত নয় প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর সাক্ষাত পাওয়া যায়

বুদ্ধির মাত্রা, মনো-দৈহিক ও আচরনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের নিম্নলিখিত স্তর বা শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা:

(ক) মানসিক প্রতিবন্ধী

(খ) পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা

(গ) আচরণ বৈকল্য (আবেগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত)

(ঘ) ভাব বিনিময় বৈকল্য (কথা বলা ও ভাষা ব্যবহারে অক্ষমতা)

(ঙ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী

(চ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

(ছ) শারীরিক প্রতিবন্ধী

(জ) গুরুতর বাধাগ্রস্ত

(ঝ) মেধাবী ও বিশেষ গুন সম্পন্ন শিশু।

সংক্ষেপে এই শ্রেণি বিভাগগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করা হল:

মানসিক প্রতিবন্ধী

মানসিক প্রতিবন্ধী কারা এ নিয়ে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সমাজ সেবকরা বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। মোটামুটিভাবে বলা যায়, জীবনের শুরু থেকে যে সকল শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি দুর্বল বা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, বাড়ন্ত বয়সে মানসিক বিকাশের গতি ধীর, শিক্ষা গ্রহণে যারা অক্ষম এবং যারা বয়সোপযোগী সামাজিক আচরণ করতে পারেন না তারাই মানসিক প্রতিবন্ধী। ওয়েস্‌লার (Wechler) এবং টারম্যান (Terman) নামে দু'জন মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q) র উপর ভিত্তি করে মানসিক প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তাঁদের মতে, যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা (I.Q) [কোন আদর্শায়িত বুদ্ধি অভীক্ষায় (Standarised Intelligence Test) প্রাপ্ত স্কোর] ৭০ এর নিচে তারা মানসিক প্রতিবন্ধী। মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বাভাবিক গড়ে বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০। American Association of Mental Relationship (AAMR) আধুনিককালে মানসিক প্রতিবন্ধীর সর্বাধিক গৃহীত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর সংজ্ঞায় যে বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান তা হল-

ক. ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক কোন আদর্শায়িত বুদ্ধি অভীক্ষা অনুসারে ৭০ বা তার কম হবে।

খ. প্রতিবন্ধীতার সৃষ্টি হবে মাতৃদেহে গর্ভধারণ (Conception) হতে শিশুর বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত যে কোন সময়ে।

গ. ব্যক্তি তার নিজের পরিবেশে ভালভাবে বা স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অক্ষম হবে এবং সমাজের নির্দিষ্ট রীতি বা নিয়ম অনুযায়ী সমাজে অভিযোজিত হতে অক্ষম হবে।

পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা

পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা বা শিখন প্রতিবন্ধী (Learning Disability) সম্বন্ধে অধিকাংশ গবেষণামূলক কাজ বিংশ শতাব্দীতে হয়েছে। Anderson (1970) এই ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুকে 'Hidden Handicap` বলে আখ্যায়িত করেছেন। পাঠ গ্রহণে অক্ষমতা বা শিখন প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষণের বিভিন্ন দিক যেমন শোনা, কথা বলা, পড়া, লেখা, চিন্তন, বানান করা, অংক করা ইত্যাদির কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রে সমস্যা থাকবে; যার কারণে শিশু শারীরিক, মানসিক বা আচরণগত প্রতিবন্ধী হয়। এই শিশুদের প্রধন বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

ক. Academic Difficulties: একই বয়সের অন্যান্য শিশুদের তুলনায় এই সব শিশুদের লেখাপড়া ও অংক কষাতে সমস্যা রয়েছে।

খ. Discrepancy Between Potential and Achievement: এই ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার তুলনায় বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত কৃতিত্ব অনেক কম।

গ. Exclusion of Other Factors: যদি কোন ব্যক্তির শিখনে অক্ষমতার কারণে তার দৃষ্টিগত বা শ্রবণ বা ভাষার প্রতিবন্ধীতা হয়, কিংবা ব্যক্তি যদি মানসিক প্রতিবন্ধী, বিকলাঙ্গ হয় অথবা শিখনে অক্ষমতার কারণ যদি প্রক্ষোভিক কোন সমস্যা বা পরিবেশগত বাধা হয় তবে ঐ ব্যক্তিকে শিখন প্রতিবন্ধী বলা যাবে না।

ঘ. Neurological Disorder: কতকগুলো স্নায়ুবিক সমস্যার কারণে ব্যক্তির মধ্যে প্রাথমিকভাবে এই ধরনের প্রতিবন্ধীতা দেখা যায়।

আচরণ বৈকল্য বা আবেগগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত

আচরণগত বৈকল্য বা আবেগগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল সে সব শিশুরাই যারা বিভিন্ন আবেগীয় সমস্যার সম্মুখীন। এদের বেশ কিছু অক্ষমতা রয়েছে যা তাদেরকে শিক্ষাগত দিক থেকে বাধাগ্রস্ত করে। এদের মধ্যে শিখনের অক্ষমতা থাকে, শিক্ষকের সাথে বা সমবয়সীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতার অভাব থাকে। আচরণকে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গির আশ্রয় নেয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনেক সময় নিজেকে গুটিয়ে নেয় বা মৌন থাকে। অনেক সময় আবার দেখা যায় স্বাভাবিক পরিবেশে অনুপযুক্ত আচরণ করছে। এই সব শিশুরা কখনো কখনো আবার খুব আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

ভাব বিনিময় বৈকল্য

এটা হল, কথা বলা ও ভাষা ব্যবহারের অক্ষমতা। শিশুর যখন বোঝার ক্ষমতা ব্যাহত হয়, প্রকাশ করার ক্ষমতা ব্যাহত হয়, তখনই এ ধরনের বৈকল্য দেখা দেয়। সাধারণত নবজাত শিশু বিভিন্ন ইশারা, কথা বলা, আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু ভাব বিনিময় বৈকল্য শিশুরা কথা বলার ক্ষেত্রে, শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে স্বরের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়। কথা বলতে গিয়ে বাক্‌যন্ত্রের ত্রুটি দেখা যায়। উপরন্তু দেখা যায় এরা ভাব আদান-প্রদান করতে পারে না। ভাষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে না। ভাষা ব্যবহারের যে রীতি-নীতি রয়েছে সেগুলো তারা সঠিকভাবে আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হয় না। ফলে মানের ভাব প্রকাশে অক্ষমতা প্রকাশ করে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী

শ্রবণ প্রতিবন্ধী হল সে সব শিশুরাই যারা বধির অর্থাৎ কানে শোনে না। সব পিতা-মাতাই চায় তার সন্তান সুস্থভাবে বেড়ে উঠুক। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে অসংখ্য শিশুকে মেনে নিতে হয় বধিরতার নিষ্ঠুর অভিশাপ। আমাদের সমাজে যাদেরকে আমরা বোবা বলি সাধারণত তাদের এ অবস্থা বধিরতার কারণেই সৃষ্ঠ। যে শিশু কানে শুনতে পায় না সেই পরবর্তীতে বোবা হয়ে যায়। পূর্বে এদেরকে মূক বা বধির বলে চিহ্নিত করা হত। কিন্তু বর্তমানে এদেরকে আমরা শ্রবণ প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করি।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হল সে ধরনের অক্ষমতা যে চোখে দেখতে পারে না। যার চোখের দৃষ্টি নেই। বর্তমান বিশ্বে ৪২ মিলিয়নেরও বেশি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী লোক আছে। তাদের দুই-তৃতীয়াংশই উন্নয়নশীল দেশে বাস করে। বর্তমানে বাংলাদেশে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন (Totally Blind) লোক (যাদের চোখে আলোর অনুভূতি নেই) এরূপ লোকের সংখ্যা ৯ মিলিয়ন। যাদের চোখে আংশিক দৃষ্টি আছে বা ৩ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত আঙ্গুল গুণতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা ২ মিলিয়ন। এই বিপুল সংখ্যক দৃষ্টিহীনের ৫০% হচ্ছে ১ মাস থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে।

শারীরিক প্রতিবন্ধী

শারীরিক প্রতিবন্ধী হল যারা শারীরিক, অস্থি বৈকল্য, অবশ, পক্ষাঘাত দ্বারা আক্রান্ত, সাধারণ ভাষায় আমরা যাদের পঙ্গু বলি, তারাও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

গুরুতর বাধাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী

গুরুতর বাধাগ্রস্ত প্রতিবন্ধীতা হল সে ধরনের অক্ষমতা যারা বহুবিধ অক্ষমতায় আক্রান্ত। হতে পারে এরা মূক-বধির এবং সেই সাথে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী অথবা মানসিক প্রতিবন্ধী ও পক্ষঘাতগ্রস্থ। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের গুরুতর এবং বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এরা অনেক সময় সারা জীবনব্যাপী অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে চলাফেরা করে।

বলা বাহুল্য মেধাবী ও বিশেষ গুণ সম্পন্ন শিশুদের ব্যতিক্রমধর্মী শিশু হিসাবে আখ্যায়িত করার কারণ তারা সাধারণ বা মধ্যম শিশুদের চেয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন, শিক্ষা-দীক্ষায় কাজে এদের বিশেষ চাহিদা থাকে। যদিও এ ধরণের যোগ্যতা সম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা খুবই কম তথাপি এরা "ব্যতিক্রমর্ধী শিশু।"

সারমর্ম

বিশেষ বা ব্যতিক্রমধর্মী শিশু হল, যারা শারীরিক মানসিক অথবা সামাজিক সমস্যার জন্য নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। এদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা, বিশেষ যত্ন এবং পরিচর্যা। বিশেষ শিশুদের আওতায় পড়ে শ্রবণ-প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মেধাবী শিশু। এই বিশেষ শিশুরা আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অখ্যায়িত হয়। এদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো হলঃ বুদ্ধিমত্তার পার্থক্য, ভাব আদান-প্রদানে সমস্যা, ইন্দ্রিয়গত পার্থক্য, আচরণগত সমস্যা এবং আরো বহুবিধ সমস্যা। বৈশিষ্ট্যের তারতম্য অনুযায়ী এদের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সমাজের কাজ হবে, এসব ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর জন্য দক্ষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ যাতে করে তারা সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে গণ্য হতে পারে।

পাঠ ৬.৪ ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর উপর পরিবার ও সমাজের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশেষ শিশুদের উপর পরিবার ও সমাজের প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিশেষ শিশুদের কীভাবে শ্রেণিকরণ করা হয় তা বলতে পারবেন।

একটি 'বিশেষ শিশু' যেখানে বাস করে তার পরিবেশ এবং পরিবারকে জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকলে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষা-দিক্ষা, পুনর্বাসন এবং তার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় সে ব্যাপারে চিন্তা করা সম্ভব। একটি প্রতিবন্ধী শিশু কীভাবে সমাজের অঙ্গিভূত হয় তা পার্শের চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে কেন্দ্রে রয়েছে শিশু এবং তার পরে বিভিন্ন ধাপে রয়েছে তার পরিবার, বিদ্যালয়, সম-বয়সী দল এবং সর্বোপরি সমাজ। এই চিত্র থেকে বুঝা যায় যে শিশুর প্রথম পরিচর্যাকারী হল তার পরিবার তারপর তার বিদ্যালয় ও সমবয়সী দল এবং সব শেষে সমাজ শিশুটির সার্বিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে।

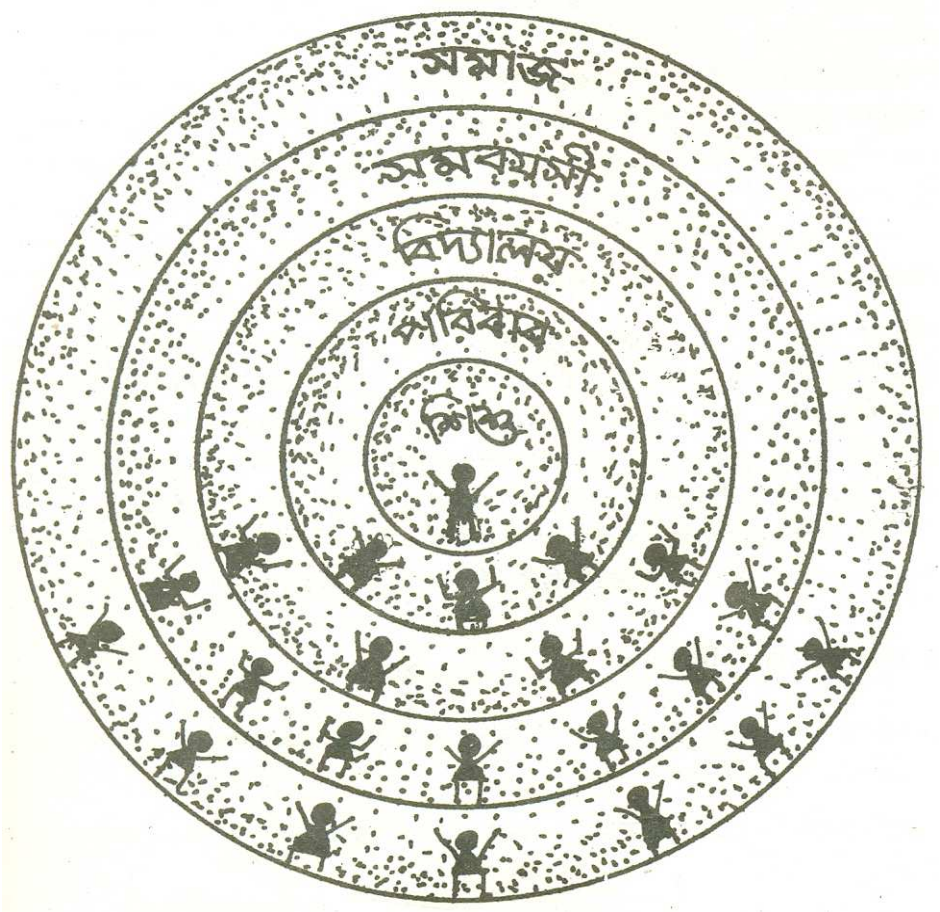

চিত্র ৬.৪.১: ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর জগত।

পরিবারের প্রভাব

ব্যতিক্রমধর্মী শিশুকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে তার পরিবার। 'বিশেষ শিশু'র প্রতিকার মূলক ব্যবস্থার জন্য কাজ করতে হবে তার পরিবারের সাথে। যত শীঘ্র সম্ভব (পাঁচ বছর বয়সের পূর্বে) শিশুর জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সাথে শিশুর পারস্পরিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে শিশুর মা, মা'কে বাদ দিয়ে কোন প্রতিবন্ধী শিশুকে সাহায্য করা একেবারেই সম্ভব নয়। এরপর আসে পিতা। একারণে পিতামাতাকে পরামর্শের মাধ্যমে বোঝাতে হবে- যে তাদের প্রতিবন্ধী শিশুটিরও বাঁচার অধিকার, শেখার অধিকার রয়েছে। ফলে সব ধরণের কুসংস্কার ও নেতিবাচক মনোভাব ত্যাগ করে তার সাথে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থায় অংশ নিতে হবে।

সমাজের প্রভাব

সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের মধ্যে অন্তভূর্ক্ত রয়েছে বিদ্যালয়, সমবয়সী দল (প্রতিবেশী হতে পারে) এবং বৃহত্তর সমাজ। এখানে মানুষের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যাবোধও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ সামাজিক ধ্যান ধারণার উপর এই সব শিশুদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। সমাজ যদি তাদের অযোগ্য ও অবাঞ্চিত মনে করে তবে এদের দাড়ানোর আর কোনই স্থান থাকবে না। তাই প্রতিবন্ধী শিশুদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা আবশ্যক।

শিশু যখন ধীরে ধীরে বড় হয় তখন তার উপর সমবয়সীদলের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে। কারণ এই সম-বয়সীদের প্রভাব দ্বারাই সে প্রভাবিত হয়। সমবয়সীরা তাদেরকে দলে মিশতে দিতে চায় না। তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করে ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা থেকে 'বিশেষ শিশুদের বিরত রাখে।

সনাক্তকরণ এবং শ্রেণিকরণ

শতাব্দীকাল পূর্বে 'বিশেষ শিশুদের' শ্রেণিকরণ এবং সনাক্তকরণ ব্যাপারটা একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বরঞ্চ সেই সময় 'প্রতিবন্ধী শিশু' বা 'ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের দূরে বা কোন অনাথ আশ্রমে সরিয়ে ফেলা হতো বা মেরে ফেলা হতো। ধীরে ধীরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চিকিৎসাবিদ এবং শিক্ষাবিদদের মধ্যে ধারণার পরিবর্তন হতে থাকে। তাঁরা চিন্তা করতে থাকেন যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের জন্য সনাক্তকরণ এবং শ্রেণিকরণ অবশ্যই প্রয়োজন। এ প্রসংগে আমেরিকান মনোবিজ্ঞান সমিতি সবচেয়ে নিদির্ষ্ট করে প্রতিবন্ধীদের তাদের প্রয়োজনীয় শ্রেণিকরণ করে। পরবর্তীকালে বিশ্বের সর্বত্রই এই শ্রেণিবিভাগকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়।

সনাক্তকরণের সুবিধা

(ক) বিশেষ শিশুদের সনাক্তকরণের ফলে বিভিন্ন ভাগ অনুযায়ী তাদের সমস্যা নিরূপণ ও চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়।

(খ) ব্যতিক্রমর্ধী শিশুদের সনাক্তকরণের ফলে তাদের বিশেষ আচরণগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।

(গ) সনাক্তকরণের মাধ্যমে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারেন এবং অনেক গবেষণালব্ধ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

(ঘ) সনাক্ত করণের ফলে 'বিশেষ শিক্ষা'র উন্নতিকল্পে আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

(ঙ) শ্রেণিকরণ এবং সনাক্তকরণের ফলে জনসমক্ষে ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের বিশেষ চাহিদাগুলো উন্মোচনা করা সহজ হয়।

সনাক্তকরণের অসুবিধা

(ক) শিশুদের মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

(খ) শিশুর নিজের সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত নিম্নমানের হয়।

(গ) সনাক্তকরণের ফলে শিশুর প্রত্যাশা কমে যায় অর্থাৎ সে হতাশ হয়ে যায়।

(ঘ) সনাক্তকরণের ফলে শিশু প্রতিবেশী এবং সমবয়সী দলের কাছ থেকে প্রত্যাক্ষাত হয়।

(ঙ) একবার যদি শিশুকে প্রতিবন্ধী বলে শ্রেণিকরণ এবং সনাক্ত করা হয় তবে সহজে সে আর স্বাভাবিক বাচ্চাদের সাথে মিশতে পারে না।

পরিশেষে এটুকুই বলবো, সনাক্তকরণের সুবিধা ও অসুবিধা যাই থাকুক না কেন আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সামান্য কোন অক্ষমতার কারণে তাকে যেন 'বিশেষ শিশু' বা ব্যতিক্রধর্মী শিশু হিসাবে আখ্যায়িত করা না হয়- তবে সেটা মারাত্মক ভুল হবে।

সারমর্মঃ

একটি বিশেষ শিশু যার বিশেষ চাহিদার প্রয়োজন রয়েছে। সেই চাহিদা পূরণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করছে তার পরিবার এবং সর্বোপরি তার মা। একটি শিশু কোন পরিবেশে মানুষ হচ্ছে- তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে পরিবার, বিদ্যালয়, সম-বয়সী দল এবং সমাজ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে কাজ করে। ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর প্রতিকারের জন্য কাজ করতে হবে তার পিতামাতার সাথে। 'মা'- কে বাদ দিয়ে কোন প্রতিবন্ধী শিশুকে সাহায্য করার একেবারেই সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে বৃহত্তর সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান। কারণ সামাজে গ্রহণযোগ্যতার উপর নির্ভর করে এইসব শিশুদের ভবিষ্যৎ। এসব প্রতিবন্ধী শিশু কোন আলাদা শিশু নয়। এদেরও বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হিসাব অনুযায়ী প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধীর শিকার। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে একষাথে হয়ে কাজ করি এদের সেবায়।

পাঠ ৬.৫ বিশেষ শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশেষ শিক্ষা কি তা বলতে পারবেন;
- বিশেষ শিক্ষার জন্য প্রচলিত কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিশেষ শিক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন ধরণের শিক্ষকের তালিকা প্রস্তুত করতে পারবেন।

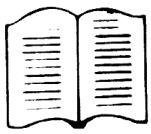

সমাজে প্রতি ১০ জনে একজন প্রতিবন্ধী শিশু পাওয়া যায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, সারা পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রতিবন্ধীর সংখ্যা শতকরা ১০ জন, অর্থাৎ ১০টি পরিবারের মধ্যে ১টি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সাথে জড়িত। এই হিসাব মতে, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার যদি ১২ কোটি হয় তবে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১ কোটি ২০ লাখ। ফলে সমগ্র জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ "প্রতিবন্ধী" হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। মূলতঃ দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, অশিক্ষা, মহামারীর ব্যপকতা, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও চিকিৎসার অভাব, নারী নির্যাতন ইত্যাদি কারণকে প্রতিবন্ধীত্বের কারণ হিসাবে ধরা হয়। বলা বাহুল্য এসব কারণ অতিমাত্রায় আমাদের দেশে বিদ্যমান বলে এদেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা আরো বেশি হবে বলে আশংকা করা হয়। ১৯৮৭-১৯৯০ সনে বাংলাদেশে পাঁচ প্রকার প্রতিবন্ধীত্ব (দৃষ্টি, শ্রবন, মানসিক, শারীরিক এবং স্নায়ুবিক) সনাক্তকরণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে সারা দেশে ১০ হাজার শিশুদের উপর একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, প্রতি দশ হাজার শিশুর মধ্যে প্রায় ৬৮ জন শিশু কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধীত্বের শিকার।

বিশেষ শিক্ষার সংজ্ঞা

বিশেষ শিশু বা ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের চাহিদা মেটানোর জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন তাকেই "বিশেষ শিক্ষা" বলা হয়। বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরণের সরঞ্জাম অথবা উপকরণ এবং বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ- দৃষ্টিহীনদের জন্য বড় অক্ষরে লেখা অথবা ব্রেলের প্রয়োজন, বধিদের জন্য "হিয়ারিং এইড" অথবা "সাংকেতিক ভাষার" প্রয়োজন আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ সরঞ্জাম।

বিশেষ শিক্ষার বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

প্রতিবন্ধী শিশু এবং স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথক না হয়ে এক সাথেও হতে পারে। এরূপ ব্যবস্থাকে সমন্বিত ব্যবস্থা বলে। এই সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা হল এমন এক ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে একই স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুরাও নিয়মিত লেখাপড়া করে থাকে। এরূপ শিক্ষা কার্যক্রমে স্বাভাবিক শিশুদের শিক্ষক এবং বিশেষ শিক্ষক উভয়ই এক সাথে শিক্ষা দান করে থাকেন।

সমন্বিত কার্যক্রমে সাধারণ শিক্ষক

সম্পূর্ণ সমন্বিত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী বা ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের নিয়মিত শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকগণই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। এ ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞ তেমন প্রয়োজন হয় না। স্বল্প মাত্রায় প্রতিবন্ধী শিশুরাই এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়।

বিশেষ শিক্ষক

যে সব শিক্ষক বিশেষ শিক্ষার কাজে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশেষ শিশুদের শিক্ষাদান করেন তারাই বিশেষ শিক্ষক। মাঝারী মাত্রায় প্রতিবন্ধী শিশুরা সমন্বিত কার্যক্রমে যোগ দিতে পারে। তখন নিয়মিত শ্রেণিকক্ষের শিক্ষককে বিশেষ শিক্ষকগণ পরামর্শ এবং নির্দেশনা দিতে পারেন। বিশেষ শিক্ষার বিভিন্ন সরঞ্জামাদি এবং উপকরণ ব্যবহার করার পদ্ধতি তাঁরা বুঝিয়ে দিতে পারেন।

ভ্রাম্যমান শিক্ষক

বিশেষ শিক্ষক ভ্রাম্যমান বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করে থাকেন। যেমন- এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে উপস্থিত হয়ে নিয়মিত শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকদের পরামর্শ এবং নির্দেশনা দিতে পারেন। অথবা ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের ব্যক্তিগতভাবে এবং ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিশেষ শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

রির্সোস শিক্ষক

শিক্ষায় বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিকেই রিসোর্স শিক্ষক বলে। রির্সোস শিক্ষক একাই একটি স্কুলে বিশেষজ্ঞের সব কাজ করেন। ব্যতিক্রমধর্মী শিশুরদের প্রয়োজনবোধে প্রশিক্ষণ দান এবং নিয়মিত শ্রেণিকক্ষের শিক্ষকদেরও সাহায্য করেন।

স্বাভাবিক শিশুদের বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষা শ্রেণি

বিশেষ শিক্ষকের পরিচালনায় স্বল্প এবং মাঝারী মাত্রার প্রতিবন্ধীরা উক্ত শ্রেণির অন্তভূর্ক্ত হতে পারে। বিশেষ শিক্ষা শ্রেণি একটি নিয়মিত বিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত থাকে এবং তারা স্বাভাবিক শিশুদের সাথে মেলামেশা করে, তবে শুধু সংগীত আঁকা এবং শরীর চর্চা ক্লাসে তাদের সম্পৃক্ত করা হয়।

বিশেষ বিদ্যালয়

এ ধরণের স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুরা আলাদাভাবে সারাদিনের জন্য প্রশিক্ষণ পায়। এখানে বিশেষ বিশেষ শিক্ষকবৃন্দ সরঞ্জামাদি এবং পরিচর্যার মাধ্যমে শিশুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এই বিদ্যালয়ের সকল শিশুরাই প্রতিবন্ধী শিশু। এই শিশুদের প্রতিবন্ধীদের মাত্রা সামান্য থেকে গুরতর যে কোন পর্যায়েরই হতে পারে।

আবাসিক স্কুল

দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী বিশেষ শিশুদের শিক্ষার জন্য আবাসিক স্কুল রয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এসব শিশুরা সপ্তাহে ১/২ দিনের জন্য বাড়ী যাওয়ার সুযোগ পায়। এই স্কুলে দৈনন্দিন জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ ও লেখাপড়া দুটোরই চর্চা হয়ে থাকে।

উপসংহারে বলবো, "২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা" সফল করার জন্য বিশেষ শিক্ষাকে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা প্রয়োজন। বর্তমানে জাতি সংঘের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়মিত স্কুলের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে কারণ প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে "সবার জন্য শিক্ষা" হতে পারে না। তাই প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যয়বহুল ব্যবস্থায় না গিয়ে সমন্বিত বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই তা করা যায়।

সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশে দৃষ্টিহীনদের জন্য বেশ কিছু বেসরকারী সংস্থা কাজ করছে। এরা সমন্বিত শিক্ষার পাশাপাশি দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বসানের ব্যবস্থা করছে। ঠিক একইভাবে বধির এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বেশ কিছু সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। যার বর্ণনা নিচে দেওয়া হল:

দৃষ্টিহীনদের জন্য সরকারী ব্যবস্থা: বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগ পরিচালিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল জেলায় দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার জন্য পাঁচটি প্রাথমিক স্কুল চালু রয়েছে। সরকারী অর্থে এদের জন্য ব্রেল পদ্ধতিতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বইও লেখা হয়।

সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশে মোট ৬৪টি মাধ্যমিক স্কুলে সম্পূর্ণ সমন্বিত শিক্ষা (Inclusive Education) কর্মসূচি চালু রয়েছে। প্রতিটি স্কুলে একজন করে Resource Teacher রয়েছেন। এছাড়া এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ব্রেল প্রেসও কাজ করছে।

দৃষ্টিহীনদের জন্য বেসরকারী সংস্থা

(ক) এ্যাসিস্ট্যান্স ফর দি ব্লাইন্ড চিলড্রেন (Assistance for Blind Children): উক্ত সংস্থা Bangladesh National Society for the Blind, ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল এবং অন্ধ স্কুলগুলোর জন্য ব্রেল ভাষায় রচিত বই বিতরণ করে। সমন্বিত বিদ্যালয়ে দৃষ্টিহীনদের জন্য এই সংস্থা ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে।

(খ) ব্যাপটিস্ট সংঘ অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়: উক্ত সংস্থাটি মোট ১০০ জন অন্ধ বালিকাদের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। এই বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রীরা অধ্যয়ন করে।

(গ) বাংলাদেশ দৃষ্টিহীন ফাউন্ডেশন: বর্তমানে এই ফাউন্ডেশন ভোলা, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জে দৃষ্টিহীনদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

(ঘ) জাতীয় অন্ধ ফেডারেশন: এই সংস্থা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মোট ১৬টি পুস্তক ব্রেল পদ্ধতিতে ছাপিয়েছে এবং বছরে প্রায় ১২০০ দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে।

(ঙ) হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল (Helen Keller International): ১৯৮৭ সন থেকে এই সংস্থা বাংলাদেশে দৃষ্টিহীনদের জন্য নানা ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন করেছে।

(চ) দি স্যালভেশন আর্মি (The Salvation Army): স্যালভেশন আর্মি ১৯৮০ সালে ৫০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছেলেদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পর্যায়ের স্কুল ও একটি আবাসিক হোস্টেল স্থাপন করেছে। এই কেন্দ্রে বধিরদের জন্যও একই ধরনের বিশেষ স্কুল চালু রয়েছে।

দৃষ্টিহীনদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন

(ক) সরকারী কর্মসূচি: দেশের চারটি প্রধান বিভাগে অবস্থিত দৃষ্টিহীনদের স্কুলের সাথে বয়স্কদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া Swedish International Development Agency (SIDA) এবং International Labour Organization (ILO)-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার টঙ্গি শিল্প এলাকায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও Sheltered Workshop স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রে মোট ১৫০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কাজ করছে।

(খ) বেসরকারী কর্মসূচি: বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দি ব্লাইন্ড (BNSB) পশ্চিম জার্মানীর একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই সংস্থা ঢাকা শহরের মিরপুর এলাকায় অন্ধদের জন্য একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

বধিরদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

সরকারী কর্মসূচি

(ক) বধিরদের জন্য স্কুল: প্রধান প্রধান বিভাগীয় শহরে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় একটি করে বধির স্কুল সরকারী অর্থে সামজ কল্যাণ দফতর নির্মাণ করেছে।

(খ) বয়স্কদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন: বধিরদের স্কুল প্রাঙ্গনে তাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অর্জনের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। একত্রে এসব কেন্দ্রকে ''ট্রেনিং এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর দি ফিজিক্যালী হ্যান্ডিক্যাপড'' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

বেসরকারী কর্মসূচি:

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় বধির ফেডারেশন: ঢাকার বিজয়নগরে এই ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি বধিরদের স্কুল স্থাপিত হয়েছে। এখানে মোট ১৪০০ ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এদের শিক্ষার সাথে কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(খ) হাই-কেয়ার (HI-CARE): ১৯৮২ সনে বধিরদের জন্য "হাই কেয়ার'' নামের আর একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখানে ২১ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও ৫ জন

Audiologists নিয়োজিত রয়েছেন। এখানে বধিরদের প্রাথমিক পর্যায় পযন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। এছাড়া ঢাকার বইরে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, টাঙ্গাইল, বরিশালের বানরীপাড়া ও ভোলায় বধিরদের জন্য বিশেষ স্কুল হাই-কেয়ারের উদ্যোগে খোলা হয়েছে।

(গ) সোসাইটি ফর দি এ্যাসিসটেন্স টু হিয়ারিং ইমপেয়ারর্ড চিলড্রেন (SAHIC): এই সংস্থাটি ১৯৮৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল বধিরতার প্রতিরোধ, প্রতিকার ও চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে। ১৯৯১ সালে জার্মানীর একটি সংস্থা 'Andheri Hilfe' এর সহযোগিতায় একটি বধিরদের Speech Center খোলা হয়েছে। এছাড়া বধির শিশুদের একটি সমন্বিত স্কুলও চালু হয়েছে।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বর্তমানে মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারী পর্যায়ে একটি বিশেষ স্কুল রয়েছে। এটা "ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পেশাল এডুকেশনের '' সাথে ল্যাবরেটরী স্কুল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে দুইটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু/কিশোরদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রেখেছে।

(ক) প্রতিবন্ধী শিশুদের পিতা মাতার সমন্বয়ে গঠন "দি সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব মেন্টালী রীটারডেড বাংলাদেশ'' (SCEMRB) নিয়মিত স্কুলে ১১টি বিশেষ শিক্ষা ক্লাস চালু করে ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সের প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখা, পড়া, অংক ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি পেশী সঞ্চালন, সামাজিক বোধশক্তি ও ভাব বিনিময়ের নৈপুণ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে।

এস.সি.ই.এম.আর.বি (SCEMRB) এবং নরওয়ের এসোসিয়েশন ফর দি মেন্টালী রিটার্ডেড এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৮২ সাল থেকে ১৬ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের প্রতিবন্ধী যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ঢাকার ১১টি বিশেষ শিক্ষা ক্লাস ছাড়াও দেশের অন্যান্য শহরে এস.সি.ই.এম.আর.সি প্রায় ৩৬টি বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে।

(খ) ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন ঢাকা শহরে 'কল্যাণী' নামে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষার স্কুল স্থাপন করেছে। "শিশু বিকাশ ক্লিনিকে'' অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী ও শিশু বিশেষজ্ঞের সাহায্যে পরীক্ষা করানোর পর প্রতিবন্ধী শিশু/কিশোরদের "কল্যাণীর'' প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। প্রতিবন্ধীতার মাত্রা অনুযায়ী লেখাপড়া, নাচ, গান শেখান হয়। এছাড়াও রান্না, সেলাই, তাঁতবোনা ও হস্ত শিল্প জাতীয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে "দূর প্রশিক্ষণ'' পুস্তিকা (ছবিসহ) যার মাধ্যমে বাবা/মায়েদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের সন্তানদের যত্ন ও পরিচর্যা করার।

উলে- খ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৯৩ ইং সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে "বিশেষ শিক্ষা বিভাগ'' চালু করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে বিশেষ শিক্ষায় স্নাতক (সম্মান) কোর্স এবং এমএড কার্যক্রম চালু রয়েছে। এই কার্যক্রমের অধীনে দৃষ্টি, শ্রবণ এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(গ) এছাড়া সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে 'National Centre for Special Education' এখানে দৃষ্টি, শ্রবণ এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সারমর্মঃ

ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের চাহিদা মেটানোর জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন তাকেই সাধারণত "বিশেষ শিক্ষা" বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষার জন্য বিশেষ ধরনের সরঞ্জাম, উপকরণ এবং বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। শিক্ষককে পারদর্শী হতে হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বর্তমানে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষক এবং বিশেষ শিক্ষক উভয়ই শিক্ষাদান করে থাকেন। সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়, আবাসিক বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ব্যতিক্রমধর্মী শিশু বা এসব প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এগুলো আরো সুদুরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে তারজন্য আরো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

চূড়ান্ত মূল্যায়নঃ ইউনিট ৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. নিচের উল্লিখিত কোন ধরনের শিশু ব্যতিক্রধর্মী শিশুদের আওতায় পড়ে?
ক. স্বাভাবিক শিশু
খ. সুবিধাবঞ্চিত শিশু
গ. বাধাগ্রস্থ শিশু
ঘ. অসুস্থ শিশু।

২. ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর উপর সবচেয়ে অধিক প্রভাবকারী ব্যক্তি কে?
ক. বাবা
খ. মা
গ. ভাই-বোন
ঘ. আত্মীয়-স্বজন।

৩. বৈরী পরিবেশ শিশুর উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে?
ক. শিশুকে অসুস্থ করে তোলে
খ. শিশুকে মেজাজী করে তোলে
গ. শিশুকে বিশেষ শিশুতে পরিণত করে
ঘ. শিশুকে সুবিধাবঞ্চিত করে তোলে।

৪. ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কত ছিল?
ক. ৪৮ লক্ষ
খ. ৫০ লক্ষ
গ. ৫২ লক্ষ
ঘ. ৫৪ লক্ষ।

৫. শহরের বস্তি এলাকার বালক ও বালিকাদের স্কুলে ভর্তির হার কত?
ক. যথাক্রমের ৩৮ ও ৪৩ শতাংশ
খ. যথাক্রমে ৪৩ ও ৪৯ শতাংশ
গ. যথাক্রমে ৪৯ ও ৪৩ শতাংশ
ঘ. যথাক্রমে ৪৩ ও ৪৯ শতাংশ।

৬. যেসব শিশুরা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সমস্যার জন্য দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা পুরণ করতে পারে না তাদের প্রধানত কী বলে?
ক. বিশেষ শিশু
খ. সুবিধাবঞ্চিত শিশু
গ. বাধাগ্রস্ত শিশু
ঘ. পিছিয়ে পড়া শিশু।

৭. নিচের কোন শিশুরা ব্যতিক্রমধর্মী শিশুর আওতায় পড়ে?
   ক. যারা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন
   খ. যারা অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন
   গ. যারা শারীরিকভাবে পঙ্গু
   ঘ. উপরের ক ও খ দুটোই।

৮. নিচের কোনটি বিশেষ শিশুদের বৈশিষ্ট্য নয়?
   ক. অধিক বুদ্ধিমত্তা
   খ. শারীরিক অসুস্থতা
   গ. আচরণগত পার্থক্য
   ঘ. শারীরিক সমস্যা।

৯. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে শিশুদের শতকরা কত জন প্রতিবন্ধী?
   ক. শতকরা ২ জন
   খ. শতকরা ৫ জন
   গ. শতকরা ৮ জন
   ঘ. শতকরা ১০ জন।

১০. যখন স্বাভাবিক ও বিশেষ শিশুদের একত্রে শিক্ষা দেওয়া হয় তখন এই ব্যবস্থাকে কী বলে?
   ক. মিশ্র ব্যবস্থা
   খ. সমন্বিত ব্যবস্থা
   গ. একত্রিত ব্যবস্থা
   ঘ. বিশেষ ব্যবস্থা।

নিজে নিজে করুন

১। আপনার বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণির শিশুদের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের সুবিধা বঞ্চিত ও বিশেষ শিশু হিসাবে শ্রেণিকরণ করুন।

২। সুবিধা বঞ্চিত ও ব্যতিক্রমধর্মী শিশুদের মানসিক বৈশিষ্ট্য কিরূপ? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৩। আপনার বিদ্যালয়ের বাধাগ্রস্ত ও মেধাবী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

১. সুবিধাবঞ্চিত শিশু বলতে কাদের বুঝায়?

২. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পারিপার্শ্বিক এবং আর্থসামাজিক অবস্থা বর্ণনা করুন।

৩. অর্থ, পুষ্টি, দারিদ্র ও শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার আন্ত সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

১. সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা কি ধরনের শিখন সমস্যার সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করুন।

২. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিখন সমস্যা প্রতিকারের জন্য কি করা উচিত।

৩. বস্তি এলাকার শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার কেমন?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

১. বিশেষ শিশু বলতে আপনি কী বুঝেন?

২. আমাদের সমাজে বিশেষ শিশুদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, সেগুলি কী?

৩. বিশেষ শিশুদের কত শ্রেণিতেভাগ করা হয়, সেগুলো কী?

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

১. 'বিশেষ শিশু' কারা? তাদের কি কি নামে অভিহিত করা হয়?

২. শ্রেণিবিভাগসহ বিশেষ শিশুদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩. 'বিশেষ শিশুদের' ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের প্রভাব আলোচনা করুন।

৪. 'বিশেষ শিশু'দের সনাক্তকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো তুলে ধরুণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

১. 'বিশেষ শিক্ষা'র সংজ্ঞা কী? কাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন?

২. 'বিশেষ শিক্ষা'য় বিভিন্ন ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

৩. বিশেষ শিক্ষার জন্য কত রকম শিক্ষক রয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

উত্তরমালা: ইউনিট ৬

১। গ; ২। খ; ৩। ঘ; ৪। ক; ৫। গ; ৬। ক; ৭। ঘ; ৮। খ; ৯। ঘ; ১০। খ।